নন্দিত নজরুল-সমকালে

নজরুল তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কবিতা উপন্যাস এবং গানের জন্য সমাদৃত হয়েছেন। 'বিদ্রোহী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলাদেশে নজরুল হঠাৎ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে পড়েন। চতুর্দিকে নজরুলের আহ্বান। একবার সকলে নজরুলকে চোখের দেখা দেখতে চান। ইতোমধ্যে নজরুল নানা বিপ্লবী কবিতা ও গান লিখতে শুরু করেন। এর সাথে যুক্ত হয় তাঁর সাংবাদিকতা। ইংরেজ শাসকের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে নজরুল সে সময় কাব্যগ্রন্থ এবং প্রবন্ধগ্রন্থ লিখেছিলেন তার কারণে একদিকে যেমন সে সব গ্রন্থ সরকারের রোষানলে পড়ে বাজেয়াপ্ত হয় অপরদিকে এ সবের জন্য তাঁকে কারাগার বরন করতে হয়। কারাগারে নজরুল অনশন শুরু করলে দেশবাসী বিচলিত হয়ে পড়ে। সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিক সকলেই নজরুলের অনশন ভাঙ্গাবার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই নজরুলকে কারাগারে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে বলেন ঃ Give up hunger stike, Our literature claims you এই বার্তার মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ নজরুলের প্রতিভাকে শুধু স্বীকৃতি নয়, তিনি যে সাহিত্যে নতুন ধারা এনেছিলেন সে জন্য তাঁকে অভিনন্দিতও করেছিলেন। মোহিতলাল মজুমদার পরবর্তীতে তাঁর শত্রু হয়ে গেলেও নজরুলের কাব্য প্রতিভাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাঁর ভাব-ভাষায় যে নতুনত্ব তিনি এনেছিলেন, তাকে সাহিত্যের এক নতুন দিগন্তের উদ্ভাষ হিসেবেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। নজরুলের অনশন সে সময়ের বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিক, কবি সাহিত্যিক সবাইকে যে আলোড়িত করেছিলেন, সে সময়ের পত্র পত্রিকায় তাঁর বিবরণ রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নজরুলই বোধকরি একজন সার্থক গণ জাগরণের কবি, জনতার কবি। তাঁর সমকালে তিনি গুটিকতক মানুষের নিন্দা ও সমালোচনার সম্মুখীন হলেও বাঙালী মাত্রেই তিনি জনগণমন নন্দিত কবি হিসেবেই সকলের ভালবাসা পেয়েছিলেন। জেলে থাকাকালীন তাঁর 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' সর্বকালের ইতিহাসে এক অভিনব এবং মহৎ সাহিত্য হিসেবেই স্থান লাভ করবে।

নজরুল তাঁর সমকালে যে গণমানুষের কবি হয়েছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন তিনি ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মেদিনীপুর শাখার একাদশ বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে যান। নজরুল ২৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মেদিনীপুরে অবস্থান করেছিলেন। সে সময় তিনি বেশ কয়েকটি সংবর্ধনা সত্তার বিপুলভাবে সংবর্ধিত হয়েছিলেন।

প্রথমদিনে তিনি যোগ দেন বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের মেদিনীপুর শাখার অনুষ্ঠানে। এ সময় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ তাঁকে দেখার জন্য ভীড় করেছিল। এ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ড. নরেন্দ্রনাথ সাহা। কলকাতা থেকে যাঁরা এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অমূল্যচরন বিদ্যা ভূষণ, প্রমাঙ্কুর আতর্থী, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোধ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র দেব প্রমুখ গুণীজনেরা অন্যতম।

প্রথম দিনের নাট্যানুষ্ঠানে নজরুল উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিনে নলিনী পণ্ডিতের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি স্বরচিত কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন ও গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন।

অপরাহ্নে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ভাষণ দেন বীরেন্দ্র শাসমল। নজরুল অভিনন্দনের জবাবে অসাধারণ বক্তব্য প্রদান করেন এবং গান শোনান। তৃতীয় দিনে বিকেলে মেদিনীপুর কলেজে মহিলারা নজরুলকে সংবর্ধনা জানান। ওই দিন সন্ধায় একটি স্কুলের মাঠে বিশাল জনসভায় জেলা শহরের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষে তাঁকে সংবর্ধনা জানান হয়। নজরুল এখানে দেশাত্মকবোধক সংগীত পরিবেশন করেন। আশ্চর্যের বিষয়, চতুর্থদিনে মেদিনীপুরে মাওলানারা কোরআন পাঠ করে তাঁকে অভিন্দন জানান ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

মেদিনীপুরের সংবর্ধনাই ছিল নজরুলের জীবনের প্রথম প্রকাশ্যে ব্যাপক গণসংবর্ধনা। নজরুল এ উষ্ণ সংবর্ধনায় অত্যন্ত অভিভূত এবং আবেগ পূর্ণ হয়ে পড়েছিলেন। এ সময়ে প্রকাশিত নজরুলের বিপ্লবী কাব্য ভাঙারগান তিনি মেদিনীপুর বাসির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

নজরুল যে তাঁর সময়ে কথায় অন্যকে মোহাবিষ্ট করে তুলতে পারতেন এমন অনেক ঘটনা সে সময়ে ঘটে গিয়েছিল। একটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা হলঃ

নজরুল যখন হুগলীতে থাকতেন তখন কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি মানুষেরা প্রায়ই নজরলের বাড়ীতে আসতেন। হুগলীতে থাকাকালীন সময় নজরুল চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষ বসুর নেতৃত্বে তারকেশ্বরের দুর্নীতিবাজ মোহান্ত বিতাড়নের আন্দোলনে যোগ দেন।

এ সময় তিনি মোহান্তের মোহ-অন্তের গান লিখে এবং পরিবেশন করে সমবেত শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। তাঁর গানের রুর এবং ভাষা এমনই প্রবল ছিল যে মোহান্তের অনুগত লাটিয়াল বাহিনী যারা এই আন্দোলনকে ভণ্ডুল করতে এসেছিল তারা নজরুলের গান শুনে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়েন। জনসভায় এ গান এমনই প্রভাব বিস্তার করে যে মোহান্তের লাঠিয়াল সর্দার মোহান্তের বিরুদ্ধ দাঁড়াবার শপথ গ্রহণ করে। ফলে আন্দোলনের মোড় ঘুরে যায়। নানা স্থানে মোহান্তের বিতাড়নের জন্য নানা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এ সময় নজরুল বিভিন্ন সভায় গান পরিবেশন করে আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলেন। মহাত্মা গান্ধীও নজরুলকে একজন অসাধারণ কবি এবং গায়ক হিসেবে

অভিনন্দন জানান। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে 'চরকার গান' গেয়ে সমবেত জনতাকে মুগ্ধ করেন। মহাত্মা গান্ধী সস্নেহে নজরুলকে কাছে টেনে নেন।

নজরুলের বিষের বাঁশী, ভাঙারগান সরকার বাজেয়াপ্ত করলে এ দুটি গ্রন্থ বাংলাদেশে সর্বাধিক প্রচারিত হয়েছিল। গোপনে এই গ্রন্থ দুটির অসংখ্য কপি বিক্রি হত। শুধু এ দুটি গ্রন্থই নয়, নজরুলের অগ্নিবীণা সরকার বন্ধ করতে চাইলেও তা সম্ভব হয়নি। বরং এ সবের কারণে নজরুলের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে ওঠে। ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে কংগ্রেসের দু'দিন ব্যাপী প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য ১লা মে ফরিদপুর আসেন এবং এ সময় তিনি চিত্রপরিচালক মৃনাল সেনের বাবা বিশিষ্ট আইনজীবি দীনেশ সেনের বাড়ীতে এসে ওঠেছিলেন। দীনেশ সেন নজরুলকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। 'চরকার গান' ছাড়াও এই সম্মেলনে নজরুল 'শিকল পরা ছল' এবং 'জাতের নামে বজ্জাতি' গান গেয়ে হাজার হাজার মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন। এ সময়ে তিনি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের পিতা কবীর উদ্দীনের বাড়ীতেও আতিথিয়তা গ্রহণ করেন।

এ সময় নজরুল প্রায় দু সপ্তাহ ফরিদপুরে থাকেন এবং গানে কবিতায় তিনি ফরিদপুরের গণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ এবং মাতিয়ে তোলেন। ফরিদপুরে থাকাকালীন সময়ে রাজনৈতিক কর্মী ও দেশসেবক সৈয়দ আব্দুর রবের সঙ্গে নজরুল ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হন। সৈয়দ আব্দুর রবের খাদেমুল ইসলামের মুখপত্র 'মোয়াজ্জিনে' অনেক আগেই নজরুল কবিতা লিখেছিলেন।

১৯২৫৪ সালে ১৩ই জুলাই এর দিকে নজরুল বাকুড়া সফর করেন। জানা যায়, নজরুল সেখানে গঙ্গা জল ঘাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র অমরের স্মৃতিতে নির্মিত 'অমর কানন' উদ্বোধন করেন এবং ছাত্র-যুব সমাজ দ্বারা বিপুলভাবে সমাদৃত হন।

বাকুড়া খ্রিষ্টান কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ ব্রাউন সস্ত্রীক অনেক ছাত্র নিয়ে ভোরে বাকুড়া রেলস্টেশনে নজরুলকে স্বাগত জানান এবং গলায় ফুলের মালা পরিয়ে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয় এবং হাজার মানুষের বিরাট মিছিল নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে ছাত্রাবাসে আসে। নজরুল অনুষ্ঠানে 'অমর কানন' নামে একটি স্বরচিত গান পরিবেশন করেন। বাকুড়া থেকে নজরুল বিষ্ণুপুরে যান এবং বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীতে আয়োজিত এক সভায় বক্তৃতা, গান ও কবিতা আবৃতি করেন। বাকুড়ার বিষ্ণুপুরে দলমাদল কামানের সাথে দাঁড়ানো নজরুলের ২৫ বৎসর বয়সের একটি ছবি বিত্তনামায় সংযোজিত হয়।

নজরুল তাঁর সমকালে নিজেই সম্পাদক হিসেবে সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ এবং অর্ধ সাপ্তাহিক ধুমকেতু প্রকাশ করেছিলেন। এই দুইটি সংবাদপত্র তাঁর সমকালে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয় তাঁর লেখার কারণে। অতঃপর নজরুল সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেন এবং কতিপয় বন্ধু, কুতুবউদ্দিন আহমদ, হেমন্ত কুমার সরকার ও শামসুদ্দীন হুসায়েন এর সহযোগিতায় একটি নতুন পার্টি গঠন করেন। এই পার্টির নাম দেওয়া হয়েছিল ইন্ডিয়ান

ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত লেবার স্বরাজ পার্টি (The labor Swaraj party of the Indian National Congress)। এই দলের মুখপত্র হিসেবে ২৫ ডিসেম্বর ১৯২৫ সালে সাপ্তাহিক লাঙল প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার পরিচালক ছিলেন নজরুল ইসলাম এবং সম্পাদক হিসেবে নজরুলের সৈনিক জীবনের পল্টনবন্ধু মণিভূষন মুখোপাধ্যায়ের নাম ছাপা হতো। প্রকৃত অর্থে নজরুলকেই সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করতে হতো। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতা প্রকাশ করেছিল সাম্যবাহী কবিতার উপ শিরোনামে ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, বারাঙ্গনা, পরী ও কুলিমজুর প্রকাশিত হয়েছিল।

পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন শামসুদ্দীন হুসায়েন। পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যার শুরুতে চণ্ডীদাসের একটি পদাবলীর উদ্ধৃতি থাকতো।

শুনহ মানুষ ভাই
সবার ওপর মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

জানা যায়, 'লাঙল' পত্রিকার ত্রয়োদশ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একটি আশীর্বাণী মুদ্রিত হয়।

হালধর বলরাম, আন তব সরু-ভাঙা হল
বল দাও, ফল দাও, স্তব্ধ হোক ব্যর্থ কোলাহল।

নজরুলের লেখার কারণে 'ধুমকেতুর মতো এই পত্রিকাও দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যেত এবং পুনরায় ছাপাতে হতো। 'লাঙলের' ২য় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৬ সালের ১লা জানুয়ারীতে। এই সংখ্যায় নজরুলের বিখ্যাত কবিতা কৃষকের গান প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৬ সালের ৭ জানুয়ারী এই পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল নজরুলের 'সব্যসাচী' কবিতা।

নজরুলের হুগলী থাকার সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হয় এবং নজরুল তাঁকে নিয়ে গান ও কবিতা রচনা করেন। মহাত্মা গান্ধীর আগমন উপলক্ষে 'চরখা'র কবিতা ও গান হুগলীতেই রচিত হয়েছিল। নজরুল পরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে কৃষ্ণ নগরে চলে যান।

নজরুল ১৯২৬ সালে বিভিন্ন সময়ে দিনাজপুর ময়মনসিংহ, সিলেট অঞ্চলে পরিভ্রমন করেন এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হন।

১৯২৬ সালের ২৪ জুন নজরুল প্রথমবার ঢাকায় আসেন। এ সময় তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও স্বরাজদলের অন্যতম নেতা ডাক্তার মোহিনী মোহন দাসের ঢাকা-কোর্ট সংলগ্নবাড়ীতে থাকেন। এখানে নজরুলের সাহিত্যিক বন্ধু কবি আব্দুল কাদির, মোহাম্মদ কাসেম, আব্দুল মজিদ সাহিত্যরত্ন প্রমুখদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়।

১৯২৬ সালের ২৭ জন নজরুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমূল্লাহ মুসলিম হলে আহুত মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বর্ষের চতুর্থ অধিবেশনে যোগ দেন। এই

অধিবেশনে নজরুল কাণ্ডারী হুশিয়ার' 'আমরা ছাত্রদল' 'কৃষকের গান' পরিবেশন করেন। এ সময় ঢাকার ছাত্র সমাজ বিপুলভাবে তাঁকে সংবর্ধিত করেন। ১৯২৬ সালের জুলাই মাসের বিভিন্ন তারিখে নারায়নগঞ্জ, চট্টগ্রামে কবি সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণে বেশ কয়েকটি সভায় যোগ দেন। চট্টগ্রামে তিনি হাবিবুল্লাহ বাহারের আমন্ত্রণক্রমে তাঁর মাতামহ অবসরপ্রাপ্ত স্কুল ইন্সপেক্টর খানবাহাদুর আব্দুল মজিদের বাসভবনে বেশ কয়েকদিন অবস্থান করেন।

নজরুল আতিথ্য নেবার আগেই খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ মৃত্যুবরণ করেন এবং বাড়ীতে শোকের ছায়া নেমে আসে। এ সময় চট্টগ্রামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নজরুলকে সংবর্ধিত করা হয়। সংবর্ধনা সভার উদ্যোক্তাদের মধ্যে অধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন, মহিম চন্দ্র দাস, খান সাহেব আব্দুস সাত্তার, রায় বাহাদুর কামিনী দাস, আব্দুল খালেক চৌধুরী, হাবিবুল্লাহ বাহার প্রমুখ প্রধান ছিলেন। খান বাহাদুর আব্দুল আজিজের বাসভবনে থাকার সময় নজরুল তাঁর 'সিন্দু হিল্লোল' হাবিবুল্লাহ বাহার এবং শামসুন্নাহার মাহমুদকে উৎসর্গ করেন।

অতঃপর নজরুল চট্টগ্রাম থেকে নোয়াখালীর ফেনীতে এক বিশাল সমাবেশে বক্তৃতা করেন। এখানে তিনি তাঁর বিখ্যাত গান 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' 'কারার ঐ লৌহ কপাট' 'ওঠরে চাষী' ইত্যাদি গান পরিবেশন করেন । ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নজরুল ডাক্তার আবুল কাশেমের আমন্ত্রণে তাঁর বাড়ীতে আসেন। এ সময় দৌলতপুর বিএল কলেজে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

এ সময় নজরুলের বাংলাদেশ পরিভ্রমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক এবং নির্বাচনী সফর। বাংলাদেশের গোঁড়া মুসলমানেরা নজরুলকে 'কাফের' আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু তরুণেরা ছিলেন নজরুলের ভক্ত। নির্বাচনে নজরুল জয়লাভ করতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁর এক পরিভ্রমণে বাঙালী তরুণ সমাজ তাঁকে মাথার মনি করে নিয়েছিল।

১৯২৭-২৮ সালে নজরুল ঢাকায় আসেন। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সলিমূল্লাহ মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত তরুণ মুসলিম বুদ্ধিজীবিদের সংগঠন মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম সম্মেলনে যোগ দেন। এই সম্মেলনে কাজী আব্দুল ওদুদ প্রবন্ধ উপস্থাপিত করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে নজরুলের বক্তব্য সম্মেলনে উপস্থিত সকলের মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন স্যার এ, এফ, রহমান। এ অধিবেশনে নজরুল গজল, গান ও কবিতা পরিবেশন করেন।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ ড. মাহমুদ হাসান কবি নজরুল ইসলামকে নৈশভোজে আপ্যায়িত করেন। ঢাকায় পাঁচদিন অবস্থানকালে নজরুল ব্যস্ততায় দিন কাটান। সর্বত্রই তাঁকে নিয়ে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। নজরুল হাসিমুখে সে সব

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। এ সময় জগন্নাথ হলেও তিনি ছাত্রদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

জুন ১৯২৭ খাদেমুল ইসলাম নামে তরুণ মুসলিমদের একটি সংগঠনের আমন্ত্রণে নজরুল নোয়াখালিতে যান। জানা যায়, এ সময় সোনাপুর রেলস্টেশন থেকে কবিকে আটঘোড়া চালিত শকট করে তিনমাইল পথ দীর্ঘ শোভাযাত্রাসহ খাদেমুল ইসলামের অফিস আনা হয়। পথে স্বাগত জানিয়ে ডজন খানেক তোরণ নানা রঙে সুশোভিত করা হয়। লেখা হয়ঃ 'স্বাগত বিদ্রোহী কবি স্বাগতঃ ইসলামী রেনেসাঁসের অগ্রদূত।'

'স্বাগত ঃ আমাদের প্রাণের কবি। স্বাগত সম্ভাষণ।' পরদিন খাদেকুল ইসলামের উদ্যোগে নোয়াখালিবাসীর পক্ষে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানানো হয়। এই অনুষ্ঠানে নজরুল 'ওঠরে চাষী জগৎবাসী' গানটি গাইলে পরে দ্বিতীয়বারও তাঁকে গানটি গাইতে হয় সকলের অনুরোধে।

পরে নজরুলকে নোয়াখালিবাসীর পক্ষে নোয়াখালি টাউন হলে বিপুলাকারে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রায় বাহাদুর শুভময় দত্ত। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মধ্যে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলাখ্যাত বিপ্লবী লোকনাথ বল বিশেষ ভূমিকা রাখেন।এ সভায় হিন্দু-মুসলমান নারীরাও অংশগ্রহণ করেন। সভায় মানপত্র পাঠ করেন নোয়াখালির বিশিষ্ট আইনজীবি ও উকিল মনোমোহন কাঞ্জিলাল। কবিকে নোয়াখালিবাসীর পক্ষ থেকে সোনার দোয়াত কলম উপহার দেওয়া হয়।

অতঃপর কাঞ্জিলাল বাবুর স্ত্রীর অনুরোধে তাঁদের নলপাড়া বাসভবনে গানের আসরের ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য তিনফুট উঁচু মঞ্চ নির্মাণ করা হয়। হাজার হাজার পুরুষ মহিলা দূর দুরান্তর থেকে এ অনুষ্ঠানে নজরুলের গান শুনতে আসেন এবং বিমোহিত হয়ে ফিরে যান। অতঃপর লক্ষীপুর জেলায় নজরুলকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। কবির সম্মানে নোয়াখালি মুসলিম যুব সমিতির উদ্যোগে একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। এ অনুষ্ঠানে নজরুল প্রধান অতিথি ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন হাবিবুল্লাহ বাহার। সন্ধায় মডেল হাইস্কুলের প্রাঙ্গনে নজরুলকে বিশালভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে কবিকে রুপার মালা ও বাটি উপহার দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতার পরে কবি আবৃত্তি এবং গান গেয়ে শুনান। গানগুলির মধ্যে ছিল ঃ- 'কৃষানের গান', 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' এবং 'শিকল পরা ছল' ইত্যাদি।

১৯২৭ সালে ধর্মীয় কৃষক সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে কোন এক সময়ে নজরুল কৃষ্ণনগর থেকে সপরিবারে কুষ্টিয়ায় আসেন। এখানে তিনি কয়েকদিন হেমন্তকুমার সরকারের বাড়ীতে সপরিবারে অবস্থান করেন। এখানেও নজরুলকে একটা থিয়েটার হলে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয়। এ সময় কবি আজিজুর রহমানের হাউস হরিপুর বাড়িতে যান এবং সেখানে শহর ও গ্রামের মানুষ তাঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং

কবি তাদের উদ্দেশ্যে কবিতা, আবৃত্তি ও গান শোনান। কুষ্টিয়াতে তিনি বারকয়েক এসেছেন। চুয়াডাঙ্গায় কার্পাস ডাঙ্গাতেও থেকেছেন। এখানেই তাঁর পদ্মাগোখরো গল্পটি লেখা হয়। এখানে তিনি বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে নজরুল মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য দ্বিতীয়বার ঢাকায় আসেন। ঢাকায় এসে প্রথমে ওঠেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের হাউস টিউটার সৈয়দ আবুল হোসেনের বাসায়। এখানেই তিনি সৈনিকদের মার্চের সুরে তাঁর বিখ্যাত চল চল গানটি গান রচনা করেন।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে তিনি এই গানটি গেয়ে সম্মেলন উদ্বোধন করেছিলেন। সম্মেলন শেষে উঠেছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু ড. কাজী মোতাহার হোসেনের বর্ধমান হাউসের বাসায়। এ সময় তিনি তিন সপ্তাহব্যাপী ঢাকায় থাকেন। নজরুল ঢাকায় থাকার সময় বুদ্ধদেব বুস ও তাঁর বন্ধুরা নজরুলকে তাঁদের আড্ডায় নিয়ে যান। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেনঃ

"নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসেছেন এবং গান গেয়ে সারা শহর মাতিয়ে তুলেছেন। 'কল্লোলে' গজল গানের প্রথম পর্যায় বেরিয়ে গেছে- তারপর বয়ে চলেছে গানের অফুরন্ত স্রোত--যেন তা কখনো ক্লান্ত হবে না, ক্ষান্ত হবে না.....।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে একটি মুসলমান অধ্যাপকের বাসা, সেখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা কয়েকটি যুবক চলেছি আমাদের প্রগতির আড্ডায়। বিকেলের ঝকঝকে রোদ্দুরে সবুজ রমনা জ্বলছে। হেঁটেই চলেছি আমরা, কেউ কেউ বাইসাইকেলটাকে হাতে ধরে ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছে, জনবিরল সুন্দরপথ আমাদের কলরবে মুখর, নজরুল একাই একশো। চওড়া মজবুত জোরালো তাঁর শরীর, বড় বড় লাল-ছিট-লাগা মদিব তাঁর চোখ, মনোহর মুখশ্রী লম্বা লম্বা ঝাঁকড়া চুল তাঁর প্রাণের স্ফূর্তির মতোই অবাধ্য, গায়ে হলদে কিংবা কমলা রঙের পাঞ্জাবি এবং তার উপর কমলা কিংবা হলদে রঙের চাদর দুটোই খদ্দরের। রঙিন জামা পরেন কেন? সভায় অনেক লোকের মধ্যে চট করে চোখে পড়ে তাই, বলে ভাঙা ভাঙা গলায় হো হো করে হেসে উঠলেন।

আমাদের টিনের ঘরে নিয়ে এলাম তাঁকে, তারপর হারমোনিয়াম চা, পান, গান, গল্প, হাসি। কখন আড্ডা ভাঙলো মনে নেই- নজরুল যে ঘরে ঢুকলেন সে ঘরে ঘড়ির দিকে কেউ তাকাতো না। আমাদের প্রগতির আড্ডায় বার কয়েক এসেছেন তিনি। প্রতিবারেই আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন।

এমন উদ্দাম প্রাণশক্তি কোনো মানুষের মধ্যে আমি দেখিনি।

(বুদ্ধদেব বসু, নজরুল ইসলাম, কবিতা, কার্ত্তিক পৌষ, ১৩৫১: পৃষ্ঠা-১৮-১৯)।

নজরুল প্রকৃতি সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু আর যা বলেছেন তা হলো ঃ

"দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময়ই উছলে পড়েছে তাঁর প্রাণ, কাছাকাছি সকলকেই উজ্জীবিত করে মনের যত ময়লা, যত খেদ, যত গ্লানি সব ভাসিয়ে দিয়ে। সকল লোকই তার আপন, সব বাড়ি তাঁর নিজের বাড়ি। শ্রীকৃষ্ণের মতো, তিনি যখন যার তখন তার। জোর করে একবার ধরে আনতে পারলে নিশ্চিন্ত, আর ওঠবার নাম করবেন না- বড়ো বড়ো জরুরি এনগেজমেন্ট ভেসে যাবে। ..... হয়তো দু'দিনের জন্য কলকাতার বাইরে কোথাও গান গাইতে গিয়ে সেখানেই এক মাস কাটিয়ে এলেন। সাংসারিক দিক থেকে এ চরিত্র আদর্শ নয়, কিন্তু এ চরিত্রে রম্যতা আছে তাতে সন্দেহ কী। সেকালে বোহেমিয়ান চাল চলন অনেকের রপ্ত করেছিলেন- মনে মনে তাঁদের হিসেবের খাতায় ভুল ছিল না-- জাত বোহেমিয়ান এক নজরুল ইসলামকে দেখেছি। অপরূপ তাঁর দায়িত্বহীনতা। (বুদ্ধদেব বসু ঃ নজরুল ইসলাম কবিতা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫১ পৃ. ১৯)

বুদ্ধদেব বসু এক সময়ে নজরুলের একান্ত প্রিয়ভাজন অনুজপ্রতিম ছিলেন। তখন তাঁর কবিতা-গান সব কিছু তাঁর কাছে ছিল অসাধারণ, অনন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর সম্পর্কে ঘুন ধরে এবং তাঁকে নিয়ে লিখতে গিয়ে তিনি অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতিকে বেশ বড় করে দেখেছেন।

তাঁর লেখার এক স্থানে তিনি বলেছেন ঃ নজরুল চড়াগলার কবি, তাঁর কাব্য হৈ চৈ অত্যন্ত বেশী- এই কারণেই তিনি লোকপ্রিয়। যেখানে তিনি ভালো লিখেছেন সেখানে হৈ-চৈটাকেই কবিমণ্ডিত করেছেন, তার শ্রেষ্ঠ রচনায় দেখা যায় কিপলিং এর মত তিনি কোলাহলকে গানে বেঁধেছেন। এধরনের কবি হবার বিপদ এই যে জোর আওয়াজ হতে থাকলেই মনটা খুশি হয়, সে আওয়াজ যে অনেক ফাঁকা আওয়াজ সে খেয়াল একেবারেই থাকে না। নজরুলের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি-- অনেক লেখা তিনি লিখেছেন যাতে শুধু হৈ চৈ আছে কবিত্ব নেই। প্রেমের বা প্রকৃতির কবিতা লিখতে গিয়ে তাঁর এই দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকট হয়েছে- একটি দুটি স্নিগ্ধ কোমল কবিতা ছাড়া প্রায় সবই ভাবলুতায় আবিল, অনর্গল অচেতন বাক্যবিন্যাসে কোলা। (বুদ্ধদেব বসু ; প্রাগুক্ত)

বুদ্ধদেব বসু নজরুলের কবিতা সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করেছেন, তা কিছুটা যে সঠিক নয়-- তা বলছিনে, তবে তিনি তখন জীবনের যে আসরে নেমেছিলেন, সেখানে চড়া কথা বা চড়া আওয়াজ না দিলে একটি ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলা যেত না। আমাদের বুঝতে হবে নজরুল দেশকে নিয়েই তখন বেশী ভেবেছেন। তাঁর যে প্রতিভা ছিল, রবীন্দ্রনাথের থেকে তা কোন অংশেই কম ছিল না, বুদ্ধদেব বসু তাঁর প্রতিভাকে প্রেম ও প্রকৃতির কাছেই সমর্পন করেছিলেন।

তাঁর লেখায় দেশের মানুষের মন ভরেনি। দেশের মানুষের প্রতি তাঁর তেমন দায়বদ্ধতাও ছিল না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র ছিলেন, ডাকসাইটে অধ্যাপক ছিলেন, কবিতায়ও সেই পান্ডিত্য দারুন প্রকট। এখানে কাব্যশৈলীর কোন ত্রুটির দেখা পাওয়া যায় না। কিন্তু কবিতায় যেটা প্রাণ সেটা তিনি ধরতে গিয়েও

পারেননি। যেমনটি হয়েছিল আঁদ্রে দেলসারটো'র বেলায়। তাঁর শিল্পকর্ম সবদিক দিয়ে নিখুঁত ছিল, কিন্তু তিনি তাঁর শিল্পকর্মে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। যা মানুষের মন কাড়ে তা তার মধ্যে ছিল না। অন্যরা এই শিল্প সোকার্যে তাঁর অনেক নীচে থাকলেও তাঁরা তা পেরেছিলেন। নজরুল যখন কাব্য জগতে এসেছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ একচ্ছত্র সম্রাট। নজরুল তাঁর কাব্যকলা রীতি পরিহার করে নতুনভাবে ভাষা ও কাব্যরীতির প্রবর্তন করেছিলেন। 'বিদ্রোহী' এবং 'দারিদ্র্য' এক নতুন কাব্যকলার সফল চর্চা। 'মানুষ', কুলিমজুর, বারাঙ্গনা, ফরিয়াদ, নারী এমন অসংখ্য কবিতা রবীন্দ্র কবিতার বিরূপভাবনার প্রতিফলন। নজরুল যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে কলম যুদ্ধ করেছেন, কবিতায়, গানে, উপন্যাসে এবং সাংবাদিকতায়; এমন সর্বব্যাপী প্রতিভার সাক্ষর রবীন্দ্রনাথ কেন, সে সময় কোন বাঙালী কবিই তা দেখাতে সক্ষম হন নি। রোম যখন পুড়ছিল সম্রাট নীরো তখন প্রেমের বাদ্য বাজাচ্ছিলেন তাঁর প্রাসাদে। গোটা ভারতবর্ষ যখন বৃটিশের শোষণ এবং শাসনের আগুনে ধিকি ধিকি জ্বলছিল এবং সেই আগুনে পুড়ে মরছিল এ দেশের অগনিত মানুষ, তখন রবীন্দ্রনাথ জন গণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা এই কবিতা লিখে ভাইসরয়ের ভারতের শুভাগমনকে বরণ করে নিয়েছিলেন। জালিয়ানওয়ালা বাগের আগুনে দগ্ধ, পোড়ালাশের গন্ধ তাঁর মনকে ছুঁয়ে যেতে পারে নি, হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গায় ভারতবর্ষে যে রক্তগঙ্গা বয়ে গিয়েছিল তাকে প্রতিরোধ করতে তিনি নজরুলের মতো সব ছেড়ে অসহায়, নিঃস্ব মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে পারেন নি। বুদ্ধদেব বসুরা তখন স্বর্গের অপসরা নিয়ে পৃথিবীতে কবিতার কানন সাজাতে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু প্রেমেন মিত্র, বনফুল এবং অন্নদাশঙ্কর রায় নজরুলকে অবমাননা করেননি বরং নজরুল তাঁর কবিতায় যে নূতন ধারা এনেছিলেন তাকে তাঁরা স্বাগত জানিয়েছিলেন।

অন্নদাশঙ্কর বললেন ঃ

ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।
এই ভুল টুকু বেঁচে থাক
বাঙালী বলতে একজন আছে
দুর্গতি তার ঘুচে যাক॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেলেন ঃ

বিধাতার এক সুর
করেছিল বুঝি পথভুল
তার-ই নাম জানি নজরুল।
মলিন মাটির দেশে সে সুরের দেখেছি আগুন
দিকে দিকে অনির্বাণ শিখা,

তাহারই বরিতে আজ মহাকাল আপন হাতে
আঁকে জয়টীকা।

কাব্যে, সঙ্গীতে, আরবী-ফার্সি ভাষার এমন সফল প্রয়োগ নজরুল ব্যতিরেকে অন্য কেউ পারেননি। মোহিত লাল মজুমদার তা স্বীকার করেছিলেন।

নজরুলের মত জীবনসংগ্রাম রবীন্দ্রনাথ এমন কি বুদ্ধদেব বসুকে করতে হয়নি। রূপার চামচ মুখে নিয়ে নজরুল জন্মাননি। শৈশব, কৈশোরে গৃহদাসের কাজ তাদের করতে হয়নি। সুকান্ত যথার্থই বলেছেন ঃ

কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

কল্লোল যুগের অধিকাংশ কবিরা নজরুলের নতুন ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁদের কাব্যে। শিক্ষিতজনের কাছে বুদ্ধদেব প্রিয় হলেও হতে পারেন। নজরুল গণমানুষের হয়ে বেঁচে থাকুন। নজরুল কেমন ছিলেন, কেমন ছিল তাঁর গান এবং কবিতা সে সম্পর্কে রানুসোম (প্রতিভাবসু) লিখেছেন। এ গ্রন্থে তাঁর বিবরণ দিয়েছি।

বারংবার যে মানুষটিকে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়েছে, এই যুদ্ধের মাঝখানে থেকে তিনি বাংলা সাহিত্যিকে যা দিয়ে গেলেন- কাল তাঁকে মনে রাখবে।

যাক, এসব কথা। নজরুল জীবনে তাঁর সমকালে অসংখ্য মানুষের ভালবাসা পেয়েছেন, যেখানেই গিয়েছেন সেখানে নেমেছে মানুষের ঢল। নজরুল তাঁর সমকালেই জাতীয়ভাবেই সংবর্ধিত হয়েছেন।

১৯২৮ সালের ৯ নভেম্বর কলকাতার ওয়েলেসলি স্কোয়ারে মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে ২৩ আশ্বিন ১৩৩৫ কবি নজরুল ইসলামকে সমগ্র বাংলার পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হয়।

সভাপতি	ঃ	এস ওয়াজেদ আলী
সহ সভাপতি	ঃ	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
		জলধর সেন
		এ কে ফজলুল হক
		খান বাহাদুর আসাদুজ্জামান
		দিলীপ কুমার রায়
		আবু আহমদ
		সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজি
সম্পাদক	ঃ	কল্লোল সম্পাদক দীনেশ রঞ্জন দাশ
সওগাত সম্পাদক	ঃ	মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন

সহ সম্পাদক	ঃ	সৈয়দ জালালুদ্দিন হাশেমী
		প্রেমেন্দ্র মিত্র
		আবুল মনসুর আহমদ
		মোয়াহেদ বখত চৌধুরী
		আয়নুল হক খান
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	এস ওয়াজেদ আলী
সদস্য	ঃ	নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
		আফজাল উল হক
		আবু লোহানী
		শাহাদৎ হোসেন
		নলিনী কান্ত সরকার
		শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
		হাবিবুল্লাহ বাহার
		ফজলুর রহমান
		উমাপদ ভট্টাচার্য
		মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
		আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ

১৩ অক্টোবর ১৯২৮ সালে কলকাতা অ্যালবার্ট হলে নিখিল বঙ্গ মুসলিম যুবক সম্মেলনে নজরুলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন।

এই সম্মেলনের জন্য নজরুল, 'বাজলো কিরে ভোরের জানাই নিঁদমহলের আঁধারপুরে' গানটি উদ্বোধন সঙ্গীত হিসেবে রচনা ও পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানে নজরুল সামরিক পোষাক পরে উপস্থিত হন এবং চল চল চল গান গাইলে সম্মেলনে তরুণেরা দারুণভাবে উজ্জীবিত হয়।

সমগ্র বাংলাদেশে নজরুলকে নিয়ে তখন তোলপাড় শুরু হয়। একদিকে ইংরেজ সরকার তাঁর লেখা গ্রন্থাদি নিষিদ্ধ করার জন্য ব্যস্ত, অপরদিকে উভয় বাংলার বিভিন্ন স্থানে তাঁর আমন্ত্রণ।

১৯২৮ সালে অক্টোবর মাসে সুরমা উপত্যকা মুসলমান ছাত্র সম্মেলনে যোগ দিতে নজরুল কলকাতা থেকে সিলেটে আসেন এবং রেলস্টেশনে তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয়। এ সময় এ কে ফজলুল হক, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নজরুলের সাথে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। সিলেটের রাজা স্কুলে (গিরিশচন্দ্র বিদ্যালয়) তিনদিনব্যাপী সম্মেলন শুরু হয়।

'চল চল চল' গান গেয়ে নজরুল সম্মেলন উদ্বোধন করেন। অতঃপর সম্মেলনের সন্ধ্যার আসরে নজরুল 'বসিয়া বিজনে কেন এক মনে' 'কে বিদেশী মন উদাসী' 'বাগিচায় বুলবুলি' 'আয় বেহেস্তে কে যাবি আয়' 'যৌবন জলতরঙ্গ' ও 'কান্ডারী হুশিয়ার' গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। নজরুলের গান শুনে সিলেটবাসী আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল। করতালি এবং জিন্দাবাদ ধ্বনিতে স্কুল প্রাঙ্গন মুখরিত হয়েছিল।

পরের দিন সিলেটের বিশিষ্ট মহিলারা নজরুলকে নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করেন। এ সময় গোঁড়া মুসলিমদের একটি দল সভা ভঙ্গ করতে এলে দেওয়ান মুহম্মদ আজরফ এবং অন্যান্য তরুণদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়ে তারা পালিয়ে যায়।

এ সময় নজরুল সিলেটে বেশ কয়েকদিন অবস্থান করেন। সিলেটে অবস্থানকালে নজরুলকে নানা জনের বাড়িতেও থাকতে হয়। এখানে থাকতে অনেকের বাড়ীতে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এদের মধ্যে এম.সি. কলেজের উপাধ্যক্ষ খান বাহাদুর আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল মজিদ, খান বাহাদুর মুহাম্মদ বখত মজুমদার অন্যতম। সিলেটে থাকাকালীন সময়ে আলী আশরাফ নামে জনৈক বিত্তবান এবং বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির প্রাসাদোপম বাড়িতে নজরুলকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য, যে নজরুল তাঁর কবিতা ও গানের জন্য সারা বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। প্রায় প্রতি জেলায় একবার দু'বার করে তাঁকে যেতে হয়। বাংলাদেশে তাঁর গুণগ্রাহীর সংখ্যা বেশী ছিল। তবে সর্বত্র তাঁকে মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা হতো। নজরুল একান্ত ভাবেই অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। কিন্তু মুসলিম তরুণ সমাজের আহবানকে তিনি কখনও ফিরিয়ে দেননি।

১৯২৮ সালে ১৬ ডিসেম্বর নজরুল রাজশাহী মুসলিম ক্লাবের প্রতিষ্ঠা দিবসে যোগ দেন। নাটোর রেলস্টেশন থেকে মটরকারের শোভাযাত্রায় কবিকে রাজশাহী ক্লাব ভবনে আনা হয়। এসময় কবির সঙ্গে ছিলেন কবি শাহাদাৎ হোসেন ও কবি বন্দে আলী মিয়া।

পরের দিন ১৭ ডিসেম্বর ১৯২৮ মুসলমান ছাত্র সমাজের উদ্যোগে রাজশাহী কলেজ সংলগ্ন ফুলার হোস্টেলে কবিকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ টি টি উইলিয়াম।

রাজশাহীতে বেশ কয়েকটি স্থানে কবিকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এখানে সে সময় রাজা প্রমথনাথ টাউন হলে ভিক্টোরিয়া রঙ্গমঞ্চে নজরুলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। হিন্দু মুসলিম তরুণ সমাজ এই সংবর্ধনসায় আয়োজন করেন। নজরুল সব সম্মেলনেই তার গান কবিতা ও বক্তৃতা করেন।

পরের দিন ১৮ ডিসেম্বর ১৯২৮ নজরুল কবি রজনীকান্ত সেনের বাড়ী 'রাণী' কল্যাণীতে আমন্ত্রিত হন। এখানে ঐতিহাসিক অক্ষয় কুমার মৈত্রের সংগে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়।

সাহিত্য ও সংগীত সভা ব্যতিরেকে নজরুলকে শ্রমিকদের নানা সম্মেলনেও যোগ দিতে হত। এতে বোঝা যায় নজরুল সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে কত জনপ্রিয় কবি ছিলেন।

নজরুল দ্বিতীয়বার কুষ্টিয়ায় আসেন ১৯২৮ সালের ২৫ ডিসেম্বর। কমরেড মুজফফর আহমদের সভাপতিত্বে যতীন্দ্র মোহন হলের পরিমল রঙ্গমঞ্চে অনুষ্ঠান শুরু হয়। হেমন্তকুমার সরকার, ফিলিপ স্প্রাট প্রমুখ নেতা স্বাধীনতা সংগ্রাম ও শ্রমিক মুক্তি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ফিলিপ স্প্রাট ছিলেন গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা। এ সময়ে কুষ্টিয়াতে মোহিনী মিলস্ চালু ছিল। বহু শ্রমিক এই সভায় যোগ দেন। নজরুলকে এই সভায় বিশেষভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। নজরুল এখানে কৃষকের গান এবং 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত' পরিবেশন করেন।

একটি বিষয়ে বলা প্রয়োজন নজরুল পশ্চিমবাংলা অপেক্ষা বাংলাদেশেই অধিকমাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এর একটি কারণ ছিল যে তিনি মুসলিম বংশোদ্ভুত আমৃত্যু অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক হয়েও তিনি চেয়েছিলেন পিছিয়ে পড়া। তার মুসলিম সমাজের উন্নতি। বাংলাদেশের কট্টর মুসলমানেরা তাঁকে ইবলিশ শয়তান, কাফের নামে অভিহিত করলেও সাধারণ মুসলমানেরা বিশেষ করে তরুণ মুসলিম সমাজ তাঁকে আদর্শ জ্ঞান করে অনুসরণ করেছে। নজরুল মুসলিম সমাজের অনুষ্ঠানে গেলেও তিনি সেখানে ইসলামের উদারতার কথা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলেছেন।

লক্ষ্য করা গেছে বাংলাদেশে তিনি অধিক মাত্রায় হিন্দু-মুসলিম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেয়েছেন।

১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসে হাবিবুল্লাহ বাহারের অনুরোধ ক্রমে তিনি তাঁর বাড়ীতে এসে উঠেছেন। সেখানে হাবিবুল্লাহ বাহার এবং শামসুন্নাহার মাহমুদ তাঁর যত্ন নিয়েছেন। নজরুল চট্টগ্রামে এসে ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে বেরিয়েছেন কিশোর তরুণদের হে হুল্লোড়ে মেতেছেন।

চট্টগ্রামেই তিনি তাঁর অনেকগুলি কবিতা 'বাদল রাতের পাখি', 'স্তব্ধ রাতে' বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি, 'কর্ণফুলী' 'শীতের সিন্ধু' লিখেছিলেন। চট্টগ্রাম থাকাকালীন সময়ে চট্টগ্রাম কাউন্সী ইউনিয়নে নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা দেবার জন্য বিশাল জনসমাবেশ হয়। এ সভায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক যোগদান করেন। তাঁরা নজরুল ইসলামের বক্তৃতা গান এবং কবিতা শুনে অভিভূত হন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় দারুল উলুম মাদ্রাসার একজন প্রাক্তন সুপারিনডেন্ট এবং চট্টগ্রামের প্রথম মুসলিম প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানা এসলামাবাদ প্রেসের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আজিজুর রহমান। এই সভায় নজরুল একটি গান পরিবেশন করেন এবং শিক্ষা ও সভ্যতা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। এই সভায় নজরুলের বিরুদ্ধে যারা কুৎসা রটনা করেন তাদের সমালোচনা করা হয়।

চট্টগ্রামে থাকাকালীন সময়ে তিনি ফতেয়াবাদে মাহবুবুল আলম, দিদারুল আলম ও ওহীদুল আলম ভাইদের বাড়ীতে আতিথ্য নেন। এরা সকরেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং এখানে একটি অনুষ্ঠানে নজরুলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

নজরুল বাংলাদেশের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং সর্বত্রই জনগনের প্রীতি-শুভেচ্ছায় তিনি বিমোহিত হয়েছেন। জানুযারী শেষের দিকে অর্থাৎ ৩১ জানুয়ারী ১৯২৯ নজরুল ঠাকুরগাঁও জেলা স্কুলের পরিচালনা কমিটির সভাপতি ও মহাকুমা প্রশাসক শ্রী ফণীভুষন বন্দোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে স্কুলের মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কুত করেন। ঠাকুরগাঁও স্টেশন এক বিশাল জনতা নজরুলকে স্বাগত জানায়। এ সময় নজরুলের সঙ্গী হিসেবে কলকাতা কর্পোরেশনের সদস্য অনলবর্ষী বক্তা জালালউদ্দীন হাশেমীও চট্টগ্রাম আসেন। এখানে নজরুল তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা পাঠ করে শোনান।

নজরুলের কুষ্টিয়া আসার কথা আগেই বলেছি। নজরুল দ্বিতীয়বার কুষ্টিয়ায় আসেন একটি কৃষক সম্মেলনে যোগ দিতে। এ সময় তাঁর সঙ্গে কমরেড মুজফফ্‌র আহমদ সহ নজরুলের স্ত্রী প্রমীলা, শাশুড়ী গিরিবালা ও পুত্র বুলবুলও আসেন। কুষ্টিয়ার সাধারণ মানুষ নজরুলকে দেখবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই সভায় ভীড় করে এবং তাদের জন্য নজরুল কৃষকের গান, শ্রমিকের গান এবং জেলেদের গান শোনান। অতঃপর স্ত্রী পুত্রসহ তাঁর পরিবারকে মুজফফ্‌র আহমদের মাধ্যমে কলকাতা পাঠিয়ে দিয়ে আরো কয়েকদিন নজরুল কুষ্টিয়াতে অবস্থান করেন।

মার্চ ১৯২৯ সালে কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান তারাপদ মজুমদারে উৎসাহে এবং সৌজন্যে যতীন্দ্র মোহন হলে নজরুলকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এখান থেকে কবি তাঁর স্মৃতিজড়িত তৎকালীন চুয়াডাংগা মহাকুমার (বর্তমানে জেলা) কার্পাশডাঙ্গা ও নিশ্চিন্তপুর গ্রামে যান। সেখান থেকে ফিরে এলে পুনরায় কুষ্টিয়ার পার্শ্ববর্তী থানা কুমারখালিতে তাঁকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয়। যোগেন্দ্রনাথ এম ই স্কুলে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। নজরুল এখানে 'জাতের নামে বজ্জাতি' এই গানটি গেয়ে শোনান এবং 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আবৃতি করেন।

তিনি সাধক কবি কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদারের সমাধি সৌধ পরিদর্শন করেন। কুষ্টিয়া শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া গড়াই নদীর অপর পাড়ে হাইশ হরিপুর গ্রামে কংগ্রেস ও খেলাফত নেতা রেজোয়ান আলী খান চৌধুরীর বাড়িতে যান এবং তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেন। তবে কুমারখালির ছেউড়িয়া গ্রামে লালন ফকিরের মাজার এবং শিলাইদহ রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ীতে গিয়েছিলেন কি না তা জানা যায়নি। নজরুলের অনেক গানে বাউল ভাবনার উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর নজরুল ১৬ মার্চ ১৯২৯ সালে কুষ্টিয়া থেকে বগুড়া যান। বগুড়ার আক্কেলপুর স্টেশনে এলে তাঁকে শোভাযাত্রা করে

শহরে অভ্যর্থনা জানানো হয়। অতঃপর এক বিশাল মাঠে তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয়। এখানে বক্তৃতার পাশাপাশি নজরুল ইসলাম গান ও গজল পরিবেশন করেন।

নজরুল বাংলাদেশের প্রায় শহরেই সংবর্ধিত হয়েছেন। আমার মনে হয়, নজরুল বাংলাদেশে যত সংবর্ধনা পেয়েছেন অন্য কোন কবির ভাগ্যে তা জোটেনি। সিরাজগঞ্জ নজরুলকে যে বিপুল সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমি ইতোপূর্বেই বলেছি।

১৯৩২ সলে নভেম্বরের ৫ তারিখে সৈয়দ আসাদ উদ দৌলা সিরাজীর আমন্ত্রণে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সংঘের সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য নজরুল কলকাতা থেকে সিরাজগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছান। তাঁর মধ্যে ছিলেন সঙ্গীত শিল্পী আব্বাসউদ্দীন এবং সুফী জুলফিকার হায়দার এবং ময়মনসিংহ থেকে নির্বাচিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার তৎকালীন সদস্য গিয়াসউদ্দীন আহমদ। প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও ৭/৮ হাজার লোক তাঁকে স্টেশনে অভ্যর্থনা জানান এবং শোভাযাত্রা করে ঘোড়ার গাড়ীতে করে নগর পরিক্রমা শেষে যমুনা নদীর পার্শ্বে অবস্থিত একটি বাড়ীতে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে বিকেলে কবিকে মুসলিম তরুণ সংঘ কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে নিয়ে আসা হয। সভায় বিপুলভাবে নজরুলকে মাল্যভূষিত করা হয়। এখানে নজরুলের অভিভাষণ ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিভাষণ। 'যৌবনের ডাক' নামে এই অভিভাষণটি অত্র গ্রন্থের অন্যত্রে ছাপা হয়েছে। এখানে দু'দিন ধরে অনুষ্ঠান হয়। নজরুল ও আব্বাসউদ্দীন এখানে গান পরিবেশন করেন। এখানে অসংখ্য মহিলা সভঅয় অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের সম্মানে নজরুল 'নারী' নামে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। অতৎপর নজরুল ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বাড়ীতে যান এবং তাঁর কবর জিয়ারত করেন।

অতঃপর নজরুল ১৯৩২ সালের ২৫-২৬ ডিসেম্বর কলকাতার অ্যাল হলে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের দু'দিন ব্যাপী অধিবেশনে অংশ নেন। এ সম্মেলনে মূল সভাপতি ছিলেন মহাকবি কায়কোবাদ। নজরুল সম্মেলনে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং বেশ কিছু গান গেয়ে শোনান। এতে মহাকবি কায়কোবাদ আবেগ আপ্লুত হয়ে নজরুলকে জড়িয়ে ধরেন এবং নিজের গলার মালা নজরুলকে পরিয়ে দেন।

১৯৩৩ সালের মে মাসে নজরুল পুনরায় বাংলাদেশে গমন করেন। চট্টগ্রামের রাউজানে অনুষ্ঠিত দু'দিনব্যাপী সম্মেলনে নজরুল প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভাষাবিজ্ঞানী মুহম্মদ এনামুল হক এবং অধ্যাপক আবুল ফজল। আরো উপস্থিত ছিলেন হাবীবুল্লাহ বাহার এবং ওহীদুল আলম।

১৯৩৬ সালের ২৭জানুয়ারী নজরুল ফরিদপুর জেলা মুসলিম সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য ফদিপুর শহরে আসেন। এখানে টাউন হলে ছাত্র-জনতার বিশাল উপস্থিতিতে নজরুলকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানানো হয়। নজরুল এই অনুষ্ঠানে মুসলিম সমাজকে তাঁর মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য তরুণদের প্রতি লড়াই করার আহবান জানান।

তিনি তাঁর বক্তব্যে নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেন। ফরিদপুর শহরের আরও কয়েকটি অনুষ্ঠানে নজরুল গান পরিবেশন করেন।

অতঃপর ১৯৩৮ সালে আরও একবার নজরুল ফরিদপুর আসেন। এরপর ১৯৪০ সালে তিনি ঢাকায় আসেন। এই সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকা বেতার কেন্দ্রের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে নজরুল একদল শিল্পী সহ কলকাতা থেকে ঢাকায় এসেছিলেন।

এই সময়ে নজরুল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল এবং ফজলুল হক মুসলিম হলে সংবর্ধিত হন এবং সেখানে বক্তৃতা, গান ও কবিতা পাঠ করেন।

এরপরে নজরুল বাংলাদেশে আর কখনো এসেছিলেন কিনা তা জানা যায় না। কলকাতায় অবস্থানকালে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে মুসলিম ছাত্র-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন। অতঃপর ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতার মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন এ কে ফজলুল হক। রজত জয়ন্তীর এই অধিবেশন ছিল নজরুল জীবনের শেষ অভিভাষণ। এই বক্তৃতায় তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং সামাজিক অসাম্য এবং অত্যাচার ও ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদী মনোভঙ্গি দীপ্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে ব্যক্ত করেন।

১৯৪২ সালে কলকাতা বেতারের একটি অনুষ্ঠানে নজরুল গান করতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে যায়। আসর পরিচালক নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কবির হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার খবর বেতারের শ্রোতাদের জানিয়ে দেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্রে এটিই ছিল নজরুলের শেষ দিন।

অতৎপর তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী এ কে ফজরুল হক তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এ বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যকে সভাপতি ও অর্থমন্ত্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে কোষাধ্যক্ষ করে নজরুলের চিকিৎসার জন্য একটি সাহায্য কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁদের মধ্যে সজনীকান্ত দাস (সম্পাদক, শনিবারে চিঠি) সুফী জুলফিকার হায়দার, যুগ্ম সম্পাদক এবং সদস্য হিসেবে ছিলেন সৈয়দ স্যার, এ এফ রহমান, বদরুদ্দোজা, হুমায়ুন কবির, কবিরাজ বিমলান্দ তর্কতীর্থ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, তুষারকান্তি ঘোষ, চপলাকান্ত ভট্টচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এই কমিটি কবি পরিবারকে ৫ মাস নিয়মিত দুশো টাকা করে অর্থ সাহায্য পাঠান। ১৯৪২ সালে গঠিত নজরুল সাহিত্য কমিটি নজরুলের চিকিৎসার বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিজেই নজরুলকে চিকিৎসা করেন। অতঃপর ১৯৫২ সালের ২৭ জুন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলকাতার বিশিষ্টট সাহিত্যিকদের নিয়ে নজরুল নিরাময় কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির সভাপতি

হয়েছিলেন অতুল গুপ্ত এবং কাজী আবদুল ওদুদ অত্র কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন সজনীকান্ত দাস এবং সুফী জুলফিকার হায়দার।

অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেনঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা, স্যার এ, এফ, রহমান, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবীর, বিমলানন্দ তর্কতীর্থ, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, তুষার কান্তি ঘোষ, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য এবং গোপাল হালদার।

এরা সকলে মিলে দীর্ঘকাল নজরুলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

এই প্রসঙ্গে যেটা উল্লেখযোগ্য তা হলো সজনীকান্ত দাস প্রসঙ্গ।

সজনীকান্ত দাস নজরুলকে তাঁর কাব্যপ্রতিভা বিকাশের লগ্ন থেকে নানাভাবে তাঁকে বাধা, বিদ্রুপ ও হীন সমালোচনা করেছেন। হঠাৎ তিনি নজরুলের প্রতি তাঁর ধারণা পাল্টে খুব বন্ধুর মতো হলেন, এমন কি তাঁর অসুখ বিসুখে পাশে এসে দাঁড়ালেন। নজরুলের বিরুদ্ধে সজনীকান্ত দাস তাঁর নিয়মিত লিখেছেন 'শনিবারের চিঠি'তে কিন্তু কেউ কাউকে দেখেননি। কিভাবে তাঁদের প্রথম দেখা হয় এবং পরবর্তীতে বন্ধুত্ব ইত্যাদি এ সম্বন্ধে নজরুল বন্ধু কমরেড মুজফফ্র আহমদ লিখেছেন ঃ

"১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহ ছিল, না মার্চ মাসের আরম্ভ তা এখন আমার ঠিক মনে পড়ছে না। তবে, সম্ভবত মার্চ মাসেই হবে। একদিন বিকেল বেলা নজরুল ইসলাম ২/১ ইউরোপীয়ান এসাইলাম লেনের দোতালায় আমাদের অফিসে এলো। আমাদের অফিস মানে ওয়াকার্স এন্ড পেজান্টস পার্টি অফিস। সে দিন বিকেলে বোধ হয় নজরুল ইসলামের যথেষ্ট অবসর ছিল। সে বহুক্ষণ আমাদের অফিসে থাকল। অনেক কথা হলো তার সঙ্গে। আমাদের অনুরোধে সে স্বরচিত গান গাইল। তারপর সে কথায় কথায় বলল, একটা মজার খবর শুনবে? কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলল যে সে ট্রামে যাচ্ছিল এবং তার পাশের আসনটি খালি ছিল। সেই আসনে কিছুটা মোটা মতন একজন ভদ্রলোক এসে বসলেন। বসেই তিনি নজরুলকে বললেন যে আমি আপনার একজন ভক্ত। নজরুল তাঁর নাম জানতে চাওয়ায় উত্তর এলো সজনীকান্ত দাস।'

তখন নজরুলের অবস্থা কি রকম হয়েছিল এবং সে প্রথম সজনীকান্ত কে কি বলেছিল সে-সব কথা আমি তাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলাম না। আমি বললাম, এ কি বলছ তুমি, নজরুল? এতদিন সজনীকান্ত দাসকে চিনতে না তুমি? সে বলল, কোনো দিন দেখাই হয়নি তার সঙ্গে এর আগে।" আমার বিশ্বাস ছিল নজরুল সজনীকান্ত দাসকে চিনত এবং সজনীকান্তও নজরুলকে চিনতেন। তাদের মধ্যে হৃদ্যতা নিশ্চয় গড়ে উঠেনি। হয়তো তাঁরা কথাবার্তাও পরস্পরের সঙ্গে বলতেন না। কিন্তু নজরুল ইসলাম যে একেবারেই সজনীকান্তকে চিনত না এটা আমি ভাবতেই পারি নি। আমি নজরুলের ওপর কিঞ্চিত চটেছিলেম। বললাম, তোমার মতো লোক আমি পৃথিবীতে দুজন দেখিনি। যে-লোকটি তোমায় এত ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করলেন, খুব নির্দোষ ব্যঙ্গ বাণও নয়,

তার ওপরে আবার কত অপ-সমালোচনা তোমার করলেন, শুধু তোমার বন্ধু হওয়ার কারণে আমাদের গায়েও তিনি হুল ফুটিয়ে ছাড়লেন, সেই সজনীকান্তকে তুমি কোনোদিন দূর থেকেও দেখলে না, এটা আমার নিকটে খুবই আশ্চর্য ঠেকছে। আমি আরও বললাম, "আমার নিজেরই তো সজনীকান্তকে কত দেখার ইচ্ছে হয়েছে কারণ ক্ষমতার অপব্যবহার করলেও, যাঁকে কোনোদিন তিনি চিনেন না, জানেন না; তার গায়ে হুল ফুটিয়ে দিলেও,-- তিনি একজন শক্তিশালী লেখক। আমি তোমার মতো সাহিত্যিক আড্ডায় যাই না, কোনো গানের মজলিসেও আমার যাওয়া হয় না, আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তোমার তো তাঁকে চেনা উচিত ছিল।" যা'ক, এটা সত্য কথা যে সে দিন ট্রামে দেখার আগে নজরুল তখনও সজনীকান্ত দাসকে দেখেনি। কিন্তু সজনীকান্তের সঙ্গে ট্রামে দেখা হওয়ার খবরটি নজরুল শুধু যে আমাকেই দিয়েছিল, আর কাউকে এ কথা বলেনি, এটা হতেই পারে না।

..... সে তার সাহিত্যিক বন্ধুদের নিশ্চয় কথাটা জানিয়েছিল, আর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে সে একথা না জানিয়ে পারে না। সজনীকান্ত নিজেই যখন যেচে নজরুলের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন তখন নজরুল আর তাঁর মধ্যে যে একটা সঙ্কোচের বাধা ছিল তাতো ভেঙেই গিয়েছিল। তাঁরপর তাদের পরিচয় দানা বাঁধালো না কেন? নজরুলের আবেগ এত প্রবল ছিল যে তা সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেত। তাছাড়া নজরুলের বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার যে সজনীকান্তরও বন্ধু ছিলেন, এ কথা পরিষ্কার ভাষায় সজনীকান্তের আত্মস্মৃতিতে লেখা আছে। আমার মাথায় একথা কিছুতেই আসছে না যে সেই ট্রামে প্রথম দেখার পরে আবার 'প্রথম দেখা'(?) হওয়ার জন্য সজনীকান্তকে পাক্কা আড়াই বছর অপেক্ষা করতে হলো কেন?

সজনীকান্ত লিখেছেন ঃ

".....কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ আলাপ ও ঘনিষ্ঠতার কাহিনী বলা প্রয়োজন। "নজরুলকে 'শনিবারের চিঠি'কম গালি দেয় নাই, সত্য কথা বলিতে গেলে 'শনিবারের চিঠি'র জন্মকাল হইতেই সাহিত্যের ব্যাপারে একমাত্র নজরুলকেই লক্ষ্য করিয়াই প্রথমে উদ্যোক্তারা তাক করিতেন। তখন আমি আসিয়া জুটি নাই। অশোক যোগানন্দ-হেমন্ত এলাইয়া পড়িলে ওই নজরুলই রন্ধ্রপতেই আমি 'শনিবারের চিঠিতে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মোহিতলাল ও ওই নজরুলের কারণেই আসিয়া জুটিয়েছিলেন, তবে আমাদের ছিল স্রেফ খেলা, মোহিতলালের ছিল জীবন-মরণ সমস্যা। .... সেই নজরুলের সঙ্গে আমার ভাব হওয়া একটু বিচিত্র বটে। অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'কল্লোল যুগে' এই প্রসঙ্গে তারিফ করিয়াছেন।

"এই অঘটন ঘটাইয়াছিলেন অঘটন ঘটন পটীয়ান পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-আমাদের পবিত্রদা। মিলনের স্থানটা ধর্মস্থান ছিল না, মিলনেচ্ছুরাও ছিল না শুদ্ধম অপাপবিদ্ধম। এক মজলিসে গান বাজনার মধ্যে রাত্রি গভীর হইতে ছিল। হঠাৎ পবিত্রদা

প্রত্যাদিষ্টের মত অনুভব করিলেন এমন একটা রাত্রে In such a night as this" নজরুল এবং সজনীকান্ত পৃথক থাকিবেন, ইহা হইতে পারে না। সেই গভীর রাত্রেই তিনি 'পড়ি-কি-মরি করিয়া ছুটিলেন এবং ব্যাপারটার তাৎপর্য আমাদের ঠাহর হইতে না হইতেই মজলিশ ভবনের দ্বারে কাজীর চকচকে চকোলেট রঙের ক্রাইসলার গাড়ীর দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। মাটিতে চাদর লুটাইতে লুটাইতে তাম্বুলরাগ রক্তাঝরোষ্ঠ বক্ষ নজরুল আসিয়া ঘরে মেঝেতে দাঁড়াইতেই আসরে উপবিষ্ট আমাকে পাঁচজনে মিলিয়া জোর করিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইল। তারপর হুমদো হুমদো দুই পুরুষের নারীসুলভ কোমল ললিতবঙ্গলতা পদ্ধতিতে প্রথম মিলন সংঘটিত হইল। সদ্য পরিচয়ের 'আপনি-আজ্ঞা' সম্বোধন অর্ধঘন্টায় তুমি এবং পরবর্তী আধঘন্টায় বড় বড় করিয়া তুই তোকারির অধো ভূমিতে নামিয়া আসিল। সেদিন যাঁহাদের এই মহামিলনের মহানাটক অবলোকন করিবার সুযোগ হইয়াছিল তাঁহারা ভাগ্যবান। শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সেই ভাগ্যবানদের দলে ছিলেন। এটুকু মাত্র আমার মনে আছে।" (সজনীকান্ত দাস, আত্মস্মৃতি, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৭৫-১৭৬)

এই লেখার মধ্যেও যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রয়েছে, পাঠকমাত্র তা আবিষ্কার করতে সক্ষম। কিন্তু 'শনিবারের চিঠি'তে সজনীকান্ত দাসের সে ভাষার সঙ্গে এ ভাষার মিল নাই, তথাপি পরিহাস এবং কৌতুকের একটি ব্যঞ্জনা এই বক্তব্যে লক্ষ্য করা যায়। সজনীকান্ত দাস নজরুলের বিদ্রোহ' কে তাঁকে আক্রমণ করলেও কবিতাটি তাঁকে যে আকর্ষণ করেছিল এ সম্পর্কে সুশীল গুপ্ত বলেন ঃ 'বিদ্রোহী' কবিতাটি 'বিজলী' ও 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত হবার পর ১৩২৮ সালের মাঘ মাসের প্রবাসী'র 'কষ্টিপাথর' বিভাগে পুনর্মুদ্রিত হয়। কবিতাটি সজনীকান্তের মনে বিচিত্র ছন্দের আন্দোলন ও ভাবের দ্বন্দ্ব জাগায়। কিন্তু রচনাটি 'আমি'র বিশৃঙ্খল প্রশংসা তালিকার মধ্যে ভাবের কোনও সংগতি আবিষ্কার করতে অসমর্থ হয়ে তিনি এ বিষয়ে ছন্দের রাজা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে গিয়ে তাঁর মতামত জানতে চান। তখন সত্যেন্দ্রনাথ যা বলেন তাতে কবিতার ছন্দের উপযুক্ততা বিচারের একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে। সজনীকান্ত লিখেছেন ঃ

"তিনি বলিলেন, কবিতার ছন্দের দোলা যদি পাঠকের মনকে নাড়া দিয়ে কোনও একটা ভাবের ইংগিত দেয় তাহা হইলেই কবিতা সার্থক। 'বিদ্রোহী' কবিতা কোনও ভাবের ইংগিত দেয় কিনা, তুমিই তাহা বলিতে পারিবে।" (সজনীকান্ত দাস, আত্মস্মৃতি প্রথম খন্ড, পৃঃ ১১৩)

সুশীল গুপ্ত তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন নজরুলকে সজনীকান্ত প্রথমে দেখেন (১৯২৩) ফাল্গুনি পূর্ণিমার সন্ধ্যার একটু আগে মোহিতলালের গুনমুগ্ধ বন্ধু ও সাহিত্যরসিক কবিরাজ জীবনকালী রায়ের বাড়ীতে। এই দিন পূর্ণ চন্দ্র গ্রহণের সময় গঙ্গার আহিরীটোলাঘাটে স্নানার্থী ভিড়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্যে সায়েন্স কলেজের ছাত্র সজনীকান্ত যখন তাঁর মেসের বন্ধুদের সঙ্গে আমহার্ষ্ট স্ট্রীট ধরে উক্ত ঘাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন সুকিয়া স্ট্রীটের জংশন পার হতেই রাস্তার ডানদিকের বাড়ির

একটা ঘর থেকে উদাত্ত বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে গীত "বল মাভৈঃ মাভৈ নগযুগ ওই এল ওই রক্ত যুগান্তরে।" গান শুনে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। পরিচয় পেয়ে জানতে পারেন যে ঘরের মধ্যে সংগীতরত যুবকটিই কাজী নজরুল ইসলাম। ঐ সঙ্গীতের আসরে মোহিতলালও উপস্থিত ছিলেন কিন্তু চন্দ্রগ্রহণের সময় নিকটবর্তী বলে তিনি আর দাঁড়াতে পারেননি। গ্রহণ শেষে মেসে ফেরার পথে পুনরায় তিনি উক্ত আসরে নজরুলকে গীতিমগ্নাবস্থায় দেখতে পান। মোহিতলাল তখন বাইরে একটা চেয়ারে বসে ছিলেন। তাঁর পাশে খালি গায়ে গামছা কাঁধে দাঁড়িয়ে ছিলেন শরৎ পন্ডিত। যিনি দাদাঠাকুর নামে খ্যাত। ঘরের মধ্যে গানের আসরে দেখা গিয়েছিল নলিনীকান্ত সরকার ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে। সজনীকান্ত তাঁর প্রথম নজরুলকে দেখার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখেছেন –

"নজরুল ইসলাম বোতাম খোলা পিরহান ঘামে এবং পানের পিকে বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার কলকণ্ঠের বিরাম নাই। "বিদ্রোহী'র প্রলাপ পড়িয়া যে মানুষটির কল্পনা করিয়াছিলাম ইহার সহিত তাহার মিল নাই। বর্তমানের মানুষটিকে ভালবাসা যায়, সমালোচনা করা যায় না। এটনা বিসুভিয়াসের মত সংগীতগর্ভ এই পুরুষ, ইহার ক্রেটার– মুখে গানের লাভাস্রোত অবিশ্রান্ত নির্গত হইতেছে।' (সজনীকান্ত দাস, আত্মস্মৃতি, ১ম খন্ড, পৃ. ১২৩-২৪)

সুশীল গুপ্ত লেখেন ঃ পরবর্তীকালে সজনীকান্ত নজরুল কাব্যের গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে নজরুলের 'বিষের বাঁশী'র ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হলে সজনীকান্ত লিখেছিলেন ঃ

'স্বাভাব কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'বিশের বাঁশি' সম্প্রতি রাজরোষ মুক্ত হইয়াছে। কবি নজরুল ইসলাম রবীন্দ্র যুগেও বাঙালী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছেন। এই বিদ্রোহ প্রধানতঃ বর্তমান রাজনৈতিক শৃঙ্খল ও বন্ধনের বিরুদ্ধে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বাঙালী কবিগণ যেভাবে বহুবিধ সঙ্গীত ও কবিতার সাহায্যে বাঙালীর দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের বৃহত্তর বিপ্লবে যে কারণেই হউক তাহারা ঠিকভাবে সাড়া দেন নাই। একমাত্র কবি নজরুলই ছন্দোগানে এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন; পরবর্তী আন্দোলনের চারণ কবি তাঁহাকেই বলা যাইতে পারে। বাংলাদেশের মত অনড় ও জড় দেশকে জানাইবার জন্য যে আকোময় উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্যার প্রয়োজন ছিল কবি নজরুলের মধ্যে তাহার প্রকাশ ঘটিয়েছিল।

... কবি নজরুল ইসলামের বিষের বাঁশী এই থর থর প্রাণস্পন্দন যুগের গান। ইহার আঘাত সরকার সহ্য করিতে পারেন নাই বলিয়াই দীর্ঘকাল ইহার প্রচার রদ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি আইন শাসনমুক্ত এই বিষের বাঁশীর কথা আমরা প্রচার করিবার সুযোগ পাইতেছি।" (সজনীকান্ত দাস, বিষের বাঁশী গুলিস্তা, নজরুল সংখ্যা ১৩৫২)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসের কোন একদিন ট্রামে যেতে যেতে উভয়ের দেখা হয়েছিল। সেখানে তেমন আলাপ হয়নি। অতঃপর একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে উভয়ের মধ্যে একটি সাক্ষাৎকার ঘটে এবং উভয়ের বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এই পরিচয়ের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন।

সুশীল গুপ্ত লেখেন ঃ "পরবর্তী জীবনে সজনীকান্ত প্রয়োজনমতো মহৎ শত্রুর বেশে বন্ধু হয়ে দেখা দিয়েছেন। এই বন্ধুত্বে উভয়েই যথেষ্ট লাভবান হয়েছেন। নজরুলের চেষ্টা ও তাঁর সুরে সজনীকান্তের কতকগুলি গানের রেকর্ড প্রকাশ লাভ করে। নজরুলের দেওয়া সুরে তাঁরই 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কে ব্যঙ্গ করে লেখা 'ভান্ডারী হুশিয়ার' সঙ্গীত বিশারদ ও জাদুকর বিমল দাশগুপ্তের কণ্ঠে মেঘাফোন রেকর্ডে বিধৃত হয়। উভয়ে যৌথভাবে পাদপুরনরীতির গান লেখেন। সজনীকান্তের গান নজরুল অনেক অনুষ্ঠানে গেয়ে শোনান। ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির আমলে কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে সজনীকান্তের পরিচালনায় মাসে অন্তত একবার 'শনি মন্ডলের' আসর বসতে আরম্ভ হলে নজরুল এই আসরের সাফল্যের জন্য যথাসাধ্য সহায়তা করেন। অনেক অধিবেশনে তিনি যোগদান করে তাঁর আবৃত্তি ও গানে সেগুলিকে বিশেষ চিত্তাকার্ষক করে তুলতেন। অপরদিকে নজরুলের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সময় সজনীকান্ত তাঁর ক্ষমতানুযায়ী সাহায্য করতে কখনো ত্রুটি করেন নি।" (ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, নজরুল চলিত মানস দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৩৯৫, পৃ. ৮০-৮১)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নজরুলের মন এতই উদার ছিল যে তিনি শত্রুকেও বন্ধু করে নিতে পারতেন। কমরেড মুজফফর আহমেদ তা বলেছেন। তা না হলে নজরুল 'কান্ডারী হুশিয়ার' এর প্যারোডি 'ভান্ডারী হুশিয়ার' গানটিকে কিভাবে পরিবেশনের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন তাও আবার নিজের রচিত সুরে।

কিন্তু সজনীকান্ত যে অকৃতজ্ঞ ছিলেন না তা দেখা যায় যখন নজরুল অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সে সময় গঠিত নজরুলের চিকিৎসাজনিত কমিটিতে সজনীকান্ত দাস রয়েছেন। নজরুলের কারণেই মাওলানা আক্রাম খাঁ এবং কবি গোলাম মোস্তফাও তাঁর সুহৃদ হয়ে ওঠেন। আজীবন তাদের এই মনোভাবের পরিবর্তন হয়নি।

কিন্তু হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে একদল নজরুলকে কখনও ভালো চোখে দেখেন নি। এরা ছিলেন কট্টরপন্থী। সমকালে নজরুলের হিন্দুবন্ধুরা তাঁর জন্যে প্রাণপাত করেছেন, তাঁদের সে ভালবাসায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি ছিল না। জানা যায়, নজরুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার পরীক্ষকও নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এ কথা সত্য যে নজরুল মুসলিম তরুণদের কাজে কর্মে সহায়তা করেছেন। বস্তুত, এই তরুণ মুসলিম যুব সমাজ ছিলেন নজরুলের শক্তি। মুসলমানেরা যে হিন্দুদের থেকে

অনেক পিছিয়ে আছে, নজরুল তা দেখেছিলেন। তাই তিনি মনে প্রাণে মুসলিম সমাজের উন্নতি কামনা করেছেন। কিন্তু তিনি কখনো তাঁর হিন্দু বন্ধুদের দূরে সরিয়ে রাখেন নি।

তবে এটাও সত্য যে পূর্ববাংলার মানুষেরা নজরুলকে অকৃত্রিমভাবে ভালবেসেছেন। নজরুল তাঁর জীবনে এত অধিক সংবর্ধনা ভারতে কোথাও পাননি। নজরুলকে পূর্ববঙ্গের প্রতি জেলায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে এবং তিনি নিজেও তাদের জন্য গান, কবিতা ও বক্তৃতা করেছেন। এসব অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমান নারী পুরুষ সকলেই সমবেত হয়েছেন।

আমার জানানুসারে এমন সংবর্ধনা দুই বাংলায় কোন কবি কখনো পাননি।

পশ্চিম বাংলায় অনুষ্ঠিত নজরুলের জাতীয় সংবর্ধনা ছিল তাঁর কবি প্রতিভার অসাধারণ স্বীকৃতি। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু নজরুলের প্রতিভাকে যেভাবে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশের মধ্যে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন-তা যুগান্ত কারী বটে।

নজরুল তাঁর সমকালে কুচক্রীমহল কর্তৃক নিন্দিত ও সমালোচিত হয়েছেন। এতে তাঁর জনপ্রিয়তা দ্বিগুণ হয়েছে এবং তাঁর গ্রন্থ লিপিবদ্ধ হয়ে তিনি নন্দিত হয়েছেন এবং মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন।